OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 53 - 61
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 53 - 61
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

কবি নীরেন্দ্রনাথ : কবিতার বাহিরে ও ভিতরে

ড. অতনু শাশমল
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ভাষা-ভবন, বিশ্বভারতী
Email ID : atanumukul@gmail.com

Received Date 16. 06. 2024
Selection Date 20. 07. 2024

Keyword
Nirendranath Chakravarty, Poem, 'Dheu, Ulanga Raja, Batashi, kolkatar jishu, Real life, Kabita-Kalpanalata, Inner Meaning.

Abstract
The current year is the birth centenary of Nirendranath Chakravarty (19 October, 1924-25 December, 2018), who was awarded the Sahitya Akademi Award and other awards. Nirendranath started making rhymes from his childhood. After that Nirendranath continued to practice poetry during his school life and later in his college life. During this period, most of the poems he wrote were rejected by the magazine authority, but he continued his writings. At this time, another literary friend of his, Nani Bhowmik was also struggling for writing. The role of friends in the life of Nirendranath was undeniable. In this context, Nirendranath's poet friend Arunkumar Sarkar has to be mentioned. In fact, due to his sacrifice and effort Nirendranath Chakravarty's first poetry book 'Neel Nirjan' was published by 'Signet' Press. At that time, when Nirendranath Chakravarty's 'existence' depended on poetry, the publication of his first book of poems in the extraordinary role of a friend was a very important event in Nirendranath's poetic career. 'Neel Nirjan', published in 1954 gave Nirendranath Chakravarty recognition as a poet. Along with this book his 'Nakshatra Jayer janya' (May, 1969), 'kolkatar Jishu' (1969), 'Ulanga Raja' (July, 1971), 'Kabitar Badole Kabita' (June, 1976), 'Aj Sakale' (November, 1978), 'Jangale Ek Unmadini' (January, 1989), 'Chalisher Dinguli' (January, 1994) etc. about thirty poetry books, one 'Kabyanatya' and other poems collectively are four hundred and ninenty three in number. And from there Nirendranath Chakravarty's distinction and establishment as a poet is assured. Nirendranath experimented with the rhythm of poetry. It should also be noted that he never considered poetry as only an illusionary thing. His poems came from real life. And Nirendranath's expertises in language and rhythmic quality have made them outstanding. In this artical we have discussed about Nirendranath Chakravarty's growth and uniqueness as a poet from the very first beginning of his life.

Discussion

কবিতা কবে থেকে যে লিখছেন তা তাঁর ঠিক মনে না থাকলেও সমিল কিছু লেখা, কিছু পঙ্‌ক্তি ছেলেবেলা থেকেই লিখেছেন। ছয় বছর বয়সে দিদির ওপর রাগ করে 'বাড়ি'র সঙ্গে 'আড়ি'র মিল রেখে একটি ছড়া লিখেছিলেন।[১] এই রকমই

স্বল্প বয়সে তাঁর বহুখ্যাত 'রাত হল, ভাত দাও'-এর মতো উচ্চারণ অন্ত্যমিলহীন হলেও, আদ্যমিলের (রাত ও ভাত) ধ্বনি সাদৃশ্যের চমৎকারিত্ব কবিতার রহস্যের 'প্রথম ধাক্কা' জাগ্রত করেছিল বালক কবির মনকে। তা নাহলে এই প্রসঙ্গের কথা একাধিকবার লেখায় ও সাক্ষাৎকারে বলবেন কেন!

এরপর সমিল কিছু লেখাও তিনি লিখেছিলেন। বিশেষত বিবাহ কিংবা ওই ধরনের শুভ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে তাঁর ডাক পড়ত। সাত-আট বছর বয়সের এরকম একটি লেখার নমুনা : "বাঃ কী মজা! রাঙাপিসিমার বিয়ে, আমরা সবাই করব মজা লুচি সন্দেশ দিয়ে।"[২]

যাইহোক, 'প্রথম লেখা দেওয়াল পত্রিকায়', যখন তিনি স্কুলে পড়েন।[৩] আরো কিছু পরে যখন স্কুলে উঁচু ক্লাসে কিংবা কলেজে (বঙ্গবাসী ও সেন্ট পল্স কলেজ থেকে যথাক্রমে আইএ এবং বিএ পাশ করেন) পড়ার সময় নীরেন্দ্রনাথ প্রতিদিন তিন-চারটি করে কবিতা লিখতেন, সেগুলো নানা পত্রপত্রিকায় ছাপানোর জন্যে পাঠাতেন। তার মধ্যে বহির্বঙ্গ পাটনা-র 'প্রভাতী' কিংবা 'কাশী-র 'উত্তরা' কাগজের নাম উল্লেখযোগ্য। সেগুলো কেউ-ই তেমন ছাপাত না, সবই ফেরত আসত। এই সময় পর্বে নীরেন্দ্রনাথ ও ননী ভৌমিকের লেখালেখির কথা জানা যায়। জানা যায়, লেখালেখির জন্য তাঁদের লড়াইয়ের কথা। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'নিরুক্ত' ও সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'পূর্বাশা'র মতো কাগজে তখন কবিতা লিখছেন নীরেন্দ্রনাথ।[৪] এছাড়াও দুই বন্ধু নীরেন্দ্রনাথ ও ননী ভৌমিক এবং উভয়েরই আর এক মিত্র, গিরিশঙ্কর দাশ অর্থাৎ তিন বন্ধুতে মিলে প্রত্যেকের একটি করে গল্প দিয়ে একটি গল্প সংকলন তাঁরা প্রকাশ করেন।[৫] এই সংকলিত বই নিয়ে তাঁর এবং বুদ্ধদেব বসুর মধ্যে একটি 'তর্ক'ও হয়। যে দিনটিতে তর্ক হয়, সেই দিনেই আবার নীরেন্দ্রনাথের আর একটি কবিতা বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' থেকে ফেরত আসে।[৬] কবি নীরেন্দ্রনাথ তখন বন্ধু ননী ভৌমিকের সঙ্গে বাজি রাখলেন। অদ্ভুত একটি কাণ্ড ঘটে গেল। ফেরত-আসা কবিতাটিকে (একটি হারানো ছবি) ননী ভৌমিককে দিয়ে কপি করিয়ে, লেখকের নাম পরিবর্তন (বরুণ দেব) করে, ননী ভৌমিকের ঠিকানা লিখে দিয়ে পাঠানো হল ত্রৈমাসিক 'কবিতা' পত্রিকায়। আর স্বনামে একই কবিতা (একটি হারানো ছবি) পাঠানো হল সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'পূর্বাশা'য়। ওই সময় একই কবিতা মুদ্রিত হয়েছিল পূর্বোক্ত দুটি পত্রিকায় ভিন্ন ভিন্ন দুই কবি-নাম নিয়ে। বরুণ দেব[৭] (কবিতা পত্রিকা) ও নীরেন্দ্রনাথ (পূর্বাশা পত্রিকা)। এভাবে 'দুষ্টুমি' করে বাজি জিতেছিলেন নীরেন্দ্রনাথ। কিন্তু 'কবিতা' পত্রিকায় ওই কবিতার একটি লাইনকে (সাঁওতাল পরগনার এই ছোট গ্রামে রাত নেমে এল) বুদ্ধদেব বদলে দিয়েছিলেন এভাবে : 'সাঁওতালি ছোট গ্রামে রাত নেমে এল'। আর 'পূর্বাশা' পত্রিকায় সঞ্জয় ভট্টাচার্য এই ছত্রটির বদল ঘটিয়ে করেছিলেন এরকম : ' সাঁওতাল পরগণা : এই ছোটো গ্রামে রাত নেমে এলো'।[৮] নীরেন্দ্রনাথের মতে এর ফলে কবিতার মিশ্রকলাবৃত্ত (অক্ষরবৃত্ত) ছন্দ 'মসৃণ' থাকল বটে, কিন্তু মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দের চলনের 'পরীক্ষা-নিরীক্ষা' (পড়তে হবে : সাঁওতাল পরগনারেই ছোট গ্রামে রাত নেমে এল)-টা আর রইল না। কেননা ছন্দের ধ্বনি সবসময় সিলেবল বা দল বা 'অক্ষরের আঁচল ধরে চলে না।'[৯] মিশ্রকলাবৃত্ত বা অক্ষরবৃত্ত আসলে 'সর্বংসহা বসুন্ধরার মত। তার উপরে যতই না কেন ভার চাপানো হোক, মুখ বুজে সে সহ্য করবে।'[১০] এটা অনেক আগেই ধরতে পেরেছিলেন কবি ও ছান্দসিক নীরেন্দ্রনাথ। তাই দেখি, তাঁর কবিতা-সমগ্র ১-এর 'সংযোজনা'তে ছন্দের এমন সংকোচনকে (পরগনারেই) আগের মতো রেখে 'পরীক্ষা-নিরীক্ষা'কেই স্বীকৃতি দিয়েছেন নীরেন্দ্রনাথ। অর্থাৎ 'সাঁওতাল পরগনার এই ছোট গ্রামে রাত নেমে এল' ছত্রটি শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থেকে গেল। একেবারে 'নিজস্ব ভাষা'-য় কথা বলতে চেয়েছিলেন নীরেন্দ্রনাথ। ছন্দের ভেতরকার এই 'রহস্য' যাকে তিনি একদা মনে করেছিলেন 'অন্যের ভাষা' নয়, 'ভীষণ ধারালো একটা অস্ত্র'[১১], তারই অনন্য এক সাক্ষ্য বহন করে যেন এই কবিতা।

প্রসঙ্গত, ১৩৫৪ (১৯৪৭)-র 'এশিয়া' কবিতাটির কথা এই জায়গায় বলা যেতে পারে। কবিতাটিকে অনেক পরে বৈশাখ ১৩৭৭ অর্থাৎ মে ১৯৭০ শ্রেষ্ঠ কবিতা (দে'জ পাবলিশিং) ও ১৯৮২-র কবিতা-সমগ্র ১ (আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড)-এর 'সংযোজনা'-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শ্রেষ্ঠ কবিতা-য় 'নীলনির্জন' গ্রন্থে 'পর্যায়ভুক্ত' করে দেখানো হলেও কবিতাটি আসলে আগে 'নীলনির্জন' কাব্যে 'অন্তর্ভূত' হয়নি। রচনার সময় অনুযায়ী কবিতাটিকে পূর্বোক্ত শ্রেষ্ঠ কবিতার 'নীলনির্জন'-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যাইহোক, কবিতাটি নীহাররঞ্জন রায় সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা 'ক্রান্তি'-তে প্রকাশিত হয়েছিল।[১২] কবিতাটি কবির কাছ থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। কবি শঙ্খ ঘোষ কবিতাটিকে 'বিস্মৃতির অতল' থেকে উদ্ধার

করে দেন কবি নীরেন্দ্রনাথকে। খ্যাতনামা আলোচক অরবিন্দ পোদ্দার এই কবিতাকে 'আদর্শ সনেট' বা 'সনেটের মডেল' বলে উল্লেখ করেছেন।[১৩] বলতে চাইছি, ছন্দোবদ্ধ ভাষা দিয়ে তৈরি নিপুণ শাণিত 'অস্ত্রের' প্রমাণও এই 'এশিয়া' নামক সনেটটি।

কিন্তু ইতিপূর্বে ১৯৪৫ (১৩৫২)-এর নভেম্বরে আর একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছিল। বন্ধু ননী ভৌমিক তখন টাটা কোম্পানির চাকরি ছেড়ে দিয়ে 'কমিউনিস্ট পার্টির কমিউনে' মহেন্দ্র সরকার স্ট্রিটে থাকতে শুরু করেন, যেখানে কেবল কমিউনিস্ট দলের সদস্যরাই থাকতেন। নীরেন্দ্রনাথ তখন বিএ পাশ করে রিপন[১৪] ল'কলেজের ছাত্র। বয়স কুড়ি। ওই সময় অর্থাৎ ১৯৪৫-এর ২১ নভেম্বর (১৩৫২-র ৫ অগ্রহায়ণ) ধর্মতলা স্ট্রিটে ছাত্রদের বিক্ষোভ সভায় পুলিশের গুলিতে নিহত হন 'ছাত্রসমাজের তরুণ কর্মী'[১৫] রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন। এই দুর্ঘটনার ঘোর থেকে নীরেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'হে অশ্বারোহি! বাঁধ ভেঙে গেছে, শোনো প্লাবনের ডাক শোনো;' এই কবিতার নাম 'শহিদ রামেশ্বর'। তৎকালীন 'দেশ' পত্রিকায় এই কবিতা প্রকাশিত হয় এবং কবিতাটির খ্যাতি সেসময়ের ছাত্রসমাজকে দারুণভাবে প্লাবিত করেছিল।

অর্থাৎ 'নীরেন্দ্র চক্রবর্তী' এই নামে তাঁর প্রথম বই 'নীলনির্জন' (প্রথম সিগনেট সংস্করণ অগস্ট ১৯৫৪) প্রকাশের অনেক আগে থেকেই যে কবির লেখালেখি চলে আসছিল তা ইতিপূর্বেকার আলোচনা বলে দিচ্ছে। তবে প্রথম কবিতার বইয়ের সঙ্গে তাঁর আর এক অভিন্ন হৃদয় বন্ধুর বন্ধুত্বের কথা নীরেন্দ্রনাথ উচ্চারণ করতে ভোলেননি। তাঁর সেই বন্ধু হলেন কবি অরুণকুমার সরকার। তখন অন্য আর এক বন্ধু নরেশ গুহ-র 'দুরন্ত দুপুর' (ফাল্গুন ১৩৫৮/ ১৯৫২) কাব্যগ্রন্থ সদ্য প্রকাশিত হয়েছে। সেই সময় অরুণকুমার সরকারের কাব্য প্রকাশিত হওয়ার কথা দিলীপ গুপ্তর সিগনেট থেকে। অরুণকুমার নিজের কাব্যগ্রন্থের বদলে নীরেন্দ্রনাথের 'নীলনির্জন'কে সিগনেট থেকে প্রকাশের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।[১৬] সিগনেটের দিলীপ গুপ্ত যে আসলে অরুণকুমারের কাব্য প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, এই সত্যটি অরুণকুমার, নীরেন্দ্রনাথের কাছে গোপন করেছিলেন। একে আমরা বলতেই পারি আত্মত্যাগ। এ বিষয়ে নীরেন্দ্রনাথ পরে অরুণকুমারকে জিজ্ঞেস করলে অরুণকুমার তাঁর কবিবন্ধুকে মোক্ষম উত্তর করেছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল, কবিতা লেখাটা তাঁর কাছে 'শখের ব্যাপার।' আজ লিখছেন, কাল না-ও লিখতে পারেন। কিন্তু নীরেন্দ্রনাথের 'এক্সিসটেন্স' নির্ভর করছিল সম্পূর্ণই কবিতার ওপর। তাই তিনি এটা করতে কোনো দ্বিধা করেননি। আমরা বলতে চাইছি আরো, এটা কেবল আত্মত্যাগই নয়, অরুণকুমারের জহুরির চোখ চিনেছিল নীরেন্দ্রনাথের প্রকৃত অস্তিত্বকে, কবি সত্তাকে।

কিন্তু কী সেই সত্তা, কোথায় তার দৃষ্টি, যা প্রথম কাব্য 'নীলনির্জন'কে আরম্ভ থেকেই সংলগ্ন করে রেখেছিল, কেমনই বা তার ধরন? এবিষয়ে সামান্য কথা বলি। 'নীলনির্জন' কবিতা বইয়ের সূচনায় 'ঢেউ' কবিতাটি প্রথম কবিতা হিসেবে বিন্যস্ত না হলেও,[১৭] কবিতা-সমগ্র ১-এর 'নীলনির্জন'-এ দেখি 'কালানুক্রমিকভাবে' সাজানো কবিতাগুলির মধ্যে একেবারে প্রথম কবিতা হিসেবে রয়েছে 'ঢেউ' শীর্ষক কবিতাটি।[১৮] কবিতার নীচে রচনাকাল হিসেবে রয়েছে ১৩৫৪ সাল। এই কবিতায় সরলকলাবৃত্তের (মাত্রাবৃত্ত) পাঁচ মাত্রার চলনে 'ঢেউ' নামক একান্ত কাঙ্ক্ষিত অন্তরঙ্গ এক অস্তিত্বের অপ্রাপ্তির কথা বলেছেন কবি। এই অপ্রাপ্তিজনিত বোধ-অনুভব না থাকার কথা বর্ণিত হয়েছে সমগ্র কবিতায়। তার অভাবে শুষ্ক হয়ে যায় ভালোবাসা, 'কাছে পাওয়া' বা নৈকট্য ব্যর্থ হয়ে যায়, প্রাণে তা-ই ব্যথা হয়ে জ্বলে রাত্রিদিন। ব্যথা হানে দুঃখের মরুকঠিন হাওয়া। বলতে চাইছি, এই একটি কবিতাকে ধরেও বোঝা যায়, 'ঢেউ' নামক এক বিচিত্র বর্ণময় অস্তিত্বের (কী-রঙে ঝিলমিল জীবন) অভাবে কবিহৃদয়ের 'এক্সিসটেন্স' অর্থহীন। ভালোবাসাহীন, কৃত্রিম, কৃপণ সেই জীবনকে তাই কবি পরিত্যাগ করতে চান দ্ব্যর্থহীনভাবে : এখানে মন বড় কৃপণ— এখানে থাকব না।

তবে আরো অন্য একটি প্রসঙ্গের কথা বলা যেতে পারে 'নীলনির্জন'কে ধরে। নীরেন্দ্রনাথ নিজে একস্থানে[১৯] 'চল্লিশের দশকের সূচনা থেকেই বাংলা কবিতার দুটি স্পষ্ট ধারা'র কথা বলেছেন। এর মধ্যে একটির 'অকুণ্ঠিত স্বর ছিল রাজনৈতিক।'[২০] নীরেন্দ্রনাথের 'নীলনির্জন'-এ জীবনের 'মাধুর্যের স্বপ্ন' উচ্চারিত হলেও 'বাস্তব কঠিন'কে কিন্তু অস্বীকার করা হয়নি। প্রসঙ্গত 'তৈমুর' (৩ ভাদ্র, ১৩৫৫/ ১৯৪৮) ও 'শিয়রে মৃত্যুর হাত' (১৪ ভাদ্র, ১৩৫৮/ ১৯৫১) কবিতাদুটির কথা কবি নিজেও বলেছেন।[২১] আগেই দেখেছি, 'শহিদ রামেশ্বর'-এর মতো কবিতা তিনিও লিখেছেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দিদের মুক্তির দাবিতে 'মিরজাপুর স্ট্রিটের বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে' ছাত্রসভার পর ধর্মতলা স্ট্রিটের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 53 - 61
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নিকটবর্তী নিউ সিনেমার সামনে পুলিশের নির্বিচার লাঠি ও গুলিতে 'শহিদ' হন রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। এর প্রতিবাদে 'মিছিলে'[২২] যোগ দেন নীরেন্দ্রনাথ। কিংবা আরো পরে সম্ভবত ২০০৬-এর এপ্রিল-জুন বা তার অব্যবহিত পূর্বের নিকটবর্তী কোনো সময়ে ফরোয়ার্ড ব্লক দপ্তরে চিত্ত বসু স্মারকবক্তৃতায় 'জন-আন্দোলন ও সাহিত্য' বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তিনি। তাহলেও তাঁকে কখনোই বিশেষ রাজনৈতিক দলের বলে চিহ্নিত হতে দেখা যায় না। এবিষয়ে তাঁর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি : 'আমি কখনও কোনও পার্টির সদস্য হইনি।'[২৩] তাঁর 'আজ সকালে' কাব্যগ্রন্থ (নভেম্বর ১৯৭৮/ অগ্রহায়ণ ১৩৮৫) অন্তর্ভুক্ত ১৯৭৭-এ লেখা 'আমার ভিতরে কোনো দল নেই' (৩ মাঘ ১৩৮৩) কবিতাটি এর নির্ভীক সাক্ষ্য বহন করে আসছে। সেখানে 'দলবদ্ধতার ঘটাপটা'কে মাড়িয়ে ব্যক্তির নিজস্বতার কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, '... একবার নিজের মধ্যে উঁকি দিয়ে কথা বলতে হয় নিজস্ব ভাষায়,/ একবার দাঁড়াতে হয় নিজস্ব ইচ্ছার মুখোমুখি।'[২৪]

প্রসঙ্গত বলে নিতে চাই, 'নিজের মধ্যে উঁকি দিয়ে কথা' বলার এই ধরনকে 'পোয়েটস টক টু দেমসেলভস, উই ওনলি ওভারহিয়ার'-এর মতো প্রচলিত বাক্যের সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে হবে না। প্রকৃতপ্রস্তাবে নীরেন্দ্রনাথ এখানে কবি-ব্যক্তিত্বের উপলব্ধি 'এক্সিসটেন্স'-এর কথা বলেছেন। তাছাড়া কবি নীরেন্দ্রনাথ 'কবিতা আসলে কবিদের স্বগত-সংলাপ মাত্র'[২৫] এমন আপ্তকথাকে একাধিক স্থানে অস্বীকার করেছেন। 'কবিতা একপ্রকার আত্মকথন' হলেও তার ক্ষেত্র পরিসীমা আরো গভীর এবং বিস্তৃত। বিশেষত কবিতার ভাষা নিয়ে নীরেন্দ্রনাথের সুদূরপ্রসারী বক্তব্য প্রশ্নাতীত। তিনি 'পোয়েটিক ডিকশন'-এর কথা বলেননি। তাঁর মতে কবিতা 'শব্দকে ব্যবহার করবার একরকমের গুণপনা। ভাষার মধ্যে যা কিনা অন্যবিধ একটা দ্যোতনা এনে দেয়।'[২৬] একেই নীরেন্দ্রনাথ আরো বিস্তৃত করে বলেন, 'কবিতা আসলে ভাষার একটি স্তর, কবিতা বলে গণ্য হতে হলে আমাদের ভাবনার শব্দ-রূপকে যে-স্তরে উত্তীর্ণ হতে হবেই'।[২৭]

শুধু তাই নয়, এই সঙ্গে নীরেন্দ্রনাথ কবিতার পাঠক ও কবির কথা ভেবেছিলেন। তিনি একাধিক স্থানে কবিতার কাছ থেকে পাঠকের প্রত্যাশাকে খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখতে চেয়েছিলেন। তাঁর কাছে তিনিই 'জরুরি কবি'[২৮], যিনি পাঠককে আনন্দের সমর্থন, শোকের সান্ত্বনা ও সংগ্রামের সাহস জোগাবেন। সর্বোপরি এই প্রত্যাশার সঙ্গে সঙ্গে কবিতার মধ্যে কবির উপস্থিতির কথাও তিনি বলেছেন।[২৯] এমনকী কবিতায় কবি-কল্পনা অবশ্যম্ভাবী হলেও, তিনি একে কবির অবস্থান থেকেই অলীকলোকে বিস্তৃত করে দেখতে চাননি। তাঁর ভাষায় : 'কবিতা, কল্পনালতা'য় আমি বিশ্বাস করি না।[৩০]

অন্যত্রও বলেছেন, 'আমি তো কবিতাকে কোনও কল্পনালতা ভাবি না।'[৩১] ১৯৬৫ (২ মাঘ ১৩৭১)-র একটি কবিতায় (কবিতা, কল্পনালতা[৩২]) এ বিষয়ে কবি প্রশ্ন তুলেছেন : '...কবিতা /বলতে কি এখনও আমি কল্পনালতার ছবি দেখে যাব?' কবিতা মানে তাঁর কাছে কুয়াশার ফুল নয়। তাই তাঁর নিজের কাছেই প্রশ্ন : 'কবিতা মানে কি এই কুয়াশার ভিতরে একবার / বাঘ সিংহ হায়েনা ইত্যাদি/ পশুর দাঁতের শক্তি বুঝে নেওয়া নয়?' তাঁর এমন প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। তিনি তাই অনায়াসে বলতে পারেন : '... ভিতরে-বাহিরে ব্যাপ্ত এই অন্তহীন কুয়াশায়/ আলাপে উৎসুক ধূর্ত বাঘের খাঁচার মধ্যে হেঁটে যেতে হবে।' এর অর্থ হল, তিনি মানুষের কাছে পৌঁছতে চান, সেই পৌঁছনোর 'মাধ্যম'[৩৩] হল কবিতা। এমন 'কবিতার দিকে'র জন্যে তাঁকে দ্বারস্থ হতে হয়েছে জীবনের কাছে, মানুষের কাছে। নীরেন্দ্রনাথের প্রায় কবিতার নীচে তারিখ সালের উল্লেখ লক্ষ করা যায় তাঁর সমগ্র কবিতা-সংগ্রহগুলিতে। এরকমই একটি কবিতা হল 'নক্ষত্র জয়ের জন্য' (মে ১৯৬৯) কাব্যের অন্তর্ভুক্ত বহু পরিচিত 'বাতাসী' (কবিতা-সমগ্র ১-এ 'বাতাসী' হয়েছে 'বাতাসি') নামক কবিতাটি। ২০ অগ্রহায়ণ, ১৩৭১/ ১৯৬৪ তারিখে এটি রচিত। অল্প-অল্প শীত রাত্রির কলকাতার বাস থেকে দেখা এক অভিজ্ঞতা কবিকে 'কবিতার দিকে' নিবিষ্ট করেছিল। এরকমই ২৬ ভাদ্র ১৩৭৬/ ১৯৬৯ তারিখে লেখা 'কলকাতার যীশু'[৩৪] কাব্যের নাম-কবিতা। কিংবা ১৯৭০-এর সেপ্টেম্বরের প্রবল বর্ষণে জলমগ্ন কলকাতার শহরতলির করুণ অভিজ্ঞতার ফল হল 'উলঙ্গ রাজা'[৩৫] (জুলাই ১৯৭১) কাব্যের 'হ্যালো দমদম' (১৮ ভাদ্র, ১৩৭৭/ ১৯৭০) কবিতাটি। দেখা যায়, 'বাতাসী' কবিতার ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতার 'বাস' বদলে গিয়ে 'ট্রেন' হয়েছে। খুব বিস্তৃতভাবে না বলেও ছোট করে বলতে পারি, এর ফলে 'বাস্তবের সত্য' ছিটকে গিয়ে 'কবিতার সত্য'-র দিকে ধাবিত হয়েছে। 'বাতাসী! বাতাসী!' — এই আকুল উচ্চারণের মধ্য দিয়ে এক অদেখা 'গূঢ়ৈষা' অনুরণিত হয়েছে যেন। আর ধাবমান কলকাতার ব্যস্ততম পথে 'টাল্‌মাটাল পায়ে / রাস্তায় এক-পার থেকে

অন্য-পারে হেঁটে চলে' যাওয়া 'সম্পূর্ণ উলঙ্গ একটি শিশু'র মধ্যে 'বেথেলহেমের জ্যোতির্ময় পুরুষ'[৩৬]-এর 'মূর্ত মানবতার' ছবি ফুটে ওঠে।

কিন্তু 'হ্যালো দমদম' কবিতাটির ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, ১৩৭৯ (১৯৭২)-র 'অল্প কিছুকাল' আগে তৎকালীন কলকাতা থেকে মধ্যমগ্রামের দিকে যাওয়ার পথে 'দমদমের রান্‌ওয়ের নির্মীয়মাণ নতুন অংশের উপরে একটি গোরুর গাড়ি থেকে ইঁট নামানো হচ্ছে' দেখে কবি কৌতুক অনুভব না করে পারেননি। রান্‌ওয়ের ওপরে গোরুর গাড়ি— এমন 'অসংগতি আর কনট্রাডিকশন'[৩৭]-এর মতোই 'হ্যালো দমদম' কবিতার বিষয়। আধুনিক শহরতলি জীবনে প্রাচীন 'মোহেনজোদড়োর নর্দমা থেকে উপচে-পড়া/ নোংরা কালো জলস্রোত'-কে প্রত্যক্ষ করা অসংগতিকর (কনট্রাডিকশন) কিংবা কৌতুকজনকই নয় শুধু, তা আধুনিক শহরজীবনের মর্মান্তিক ছবিও। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, 'উলঙ্গ রাজা' কাব্যের 'হ্যালো দমদম'-এর অব্যবহিত পরবর্তী কবিতা 'বন্যার কুকুর' (২৬ ভাদ্র, ১৩৭৭/ ১৯৭০)-এও প্রায় একই রকম অভিজ্ঞতা-চিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়।

'উলঙ্গ রাজা'র অব্যবহিত পরবর্তী কাব্য 'কবিতার বদলে কবিতা' (আষাঢ় ১৩৮৩ /জুন ১৯৭৬) কাব্যগ্রন্থের দুটি কবিতায় অন্য আর এক অস্বাভাবিক অবস্থাপ্রাপ্ত জীবনের (সম্ভবত জরুরি অবস্থা[৩৮] বা ইমার্জেন্সি) 'ছায়া পড়ে থাকতে পারে'—একথা বলেছেন স্বয়ং কবি। ১৯৭৫-এর 'কবিতার বদলে' (৬ ভাদ্র, ১৩৮২/ ১৯৭৫) কিংবা 'ও পাখি!' (৬ ভাদ্র, ১৩৮২/ ১৯৭৫) কবিতায় 'অন্ধকারে'র কথা রয়েছে। আবার এক শ্রেণির কবি সম্বন্ধে 'খবুরে কাগুজে কবি'[৩৯] বলে একটি কথা বলতেন বুদ্ধদেব বসু। কিন্তু খবরের কাগজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলেই এই বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করতেন নীরেন্দ্রনাথ। খবরের কাগজের সংবাদ তাঁকে কবি হিসেবেও সাহায্য করেছে সুপ্রচুর। 'কবিতার বদলে কবিতা'র পরবর্তী 'আজ সকালে' (নভেম্বর ১৯৭৮/ অগ্রহায়ণ ১৩৮৫) কাব্যগ্রন্থের 'কালো অ্যাম্বাসাডার' (২১ মাঘ, ১৩৮৪/ ১৯৭৭) কবিতাটিকে মনে করা যেতে পারে। কবিতা রচনার সমকালে কলকাতায় পরপর ডাকাতির ঘটনা ঘটেছিল। এই ডাকাতিতে কালো অ্যাম্বাসাডার গাড়ির ব্যবহার[৪০] ঘটেছিল। কবিতায় এই ঘটনার সূত্রে 'রাষ্ট্রনীতি, ইমার্জেন্সি, আইন-শৃঙ্খলা'র প্রসঙ্গ সরাসরি উপস্থাপিত হয়েছে। এর কিছু পরবর্তী ১৯৮০-র 'স্বদেশে আমার' (২০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৭) নামক কবিতায় 'আঞ্চলিকতাভিত্তিক ক্ষুদ্রবুদ্ধি রাজনীতির 'কাঁটাতারে' ক্ষতবিক্ষত ছবিও উদ্ধৃত হয়েছে।[৪১] কিংবা আরো পরবর্তী মাত্র দুটি সুদীর্ঘ কবিতায় (রূপ-কাহিনী : আষাঢ় ১৩৯০, খড়ির দাগ : আষাঢ় ১৩৯০) সমৃদ্ধ 'রূপ-কাহিনী' (ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪) কাব্যগ্রন্থের আত্মজীবনীমূলক শৈশবস্মৃতির অনেক ঘটনাই বিবৃত হয়েছে। কবির ভাষায় 'তার চোদ্দ আনাই সত্যি, কল্পনার রং দু'আনার বেশি চড়াইনি।'[৪২] ১৯৮৭-তে লেখা 'জঙ্গলে এক উন্মাদিনী (জানুয়ারি ১৯৮৯) কাব্যের অন্তর্ভুক্ত নাম-কবিতা (১৬ আষাঢ় ১৩৯৪/ ১৯৮৭)-য় অমলাংশু চট্টরাজের স্মৃতিতে ভেসে ওঠা 'পঁচিশ বছর আগের' এক 'গুঙ্গা অবোধ উন্মাদিনী'র অসহায়তার কথা এসেছে। আধুনিক নাগরিক সভ্য-জীবন যে কতখানি 'জঙ্গলে' আকীর্ণ তা 'পার্ট টাইমের পদ্যকার ও নিরীহ চরিত্রের ভদ্রলোক'-এর চোখে পড়ে। এই প্রসঙ্গে কবি এক সাক্ষাৎকারে বানতলার অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। বলেছেন, শুধু এই গুঙ্গা উন্মাদিনীর 'পক্ষেই যে শহরটা একটা জঙ্গল তা তো নয়। এই যেমন বানতলার ব্যাপারটা, একজন মহিলা আক্রান্ত হলেন এবং মারা গেলেন, সেই তাদের পক্ষেও তো শহরটা জঙ্গল।'[৪৩]

চল্লিশের দশক বেশ কিছু আগের প্রসঙ্গ হলেও তাঁর 'চল্লিশের দিনগুলি' (জানুয়ারি ১৯৯৪) কাব্যের সুদীর্ঘ নাম-কবিতাটির (শ্রাবণ ১৩৯০/ ১৯৮৩) কথাও এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে। কবিতাটি মোট তিনটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত।[৪৪] এই কাব্যের শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক কবিতায় উত্তাল 'চল্লিশের দিনগুলি'র বেশ কিছু ছবি এখানে উপস্থিত। 'জলের জেলখানা থেকে' (জানুয়ারি ২০০০) কাব্যগ্রন্থের 'জলের জেলখানা থেকে-১' ও 'জলের জেলখানা থেকে-২' শীর্ষক দুটি কবিতাতে জলজনিত দুর্ভোগ চিত্র বর্ণিত হয়েছে।[৪৫] ১৯৯৯ সালের প্লাবন থেকে কলকাতাও নিস্তার পায়নি। বিশেষত এর নিচু এলাকার প্লাবিত জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। ইতিপূর্বে কবি 'উলঙ্গ রাজা'র 'হ্যালো দমদম' ও 'বন্যার কুকুর' কবিতায়ও এরকম অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন। ৩০ কার্তিক, ১৪০৬ (১৯৯৯) থেকে ১৯ অগ্রহায়ণ, ১৪০৬ পর্যন্ত 'পারাদীপ' সিরিজের তেরোটি কবিতায় 'সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের' ভয়াবহ পটভূমি হল উড়িষ্যার পারাদীপ।[৪৬] সেখানে যে-কোনো ধ্বনি ব্যর্থ হয়ে ফেরে, 'প্রমত্ত জলের/ দেওয়ালের ধাক্কা খেয়ে ফিরে-ফিরে আসে প্রতিধ্বনি।' আর 'সাকুল্যে তিনিজন' (নভেম্বর ২০০০) কাব্যের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 53 - 61
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নাম-কবিতায় (১২ শ্রাবণ ১৪০৭) 'তিনজনের ফ্ল্যাটে থাকবে তিনজনেরই ছোট্ট পরিবার' বা 'অতিক্ষুদ্র' 'নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি'র কথা বলা হয়েছে। ঠিক এরই বিপ্রতীপে অনেক আগে লেখা একটি কবিতার কথা চলে আসতে পারে। কবিতাটি 'কলকাতার যীশু' কাব্যের 'চতুর্থ সন্তান' (২৪ ভাদ্র ১৩৭৬) নামক অন্য একটি কবিতা। সেখানেও উচ্চারিত হয়েছে : 'দুটি কিংবা তিনটি বাচ্চা, ব্যস্!' কিন্তু ওই কবিতার 'চতুর্থ সন্তান' কথার ব্যঞ্জনা বহুদূরবর্তী। 'অপমানে বিকৃত মুখের রেখা' যার, সে এই আধুনিক সভ্যতার কাছে প্রশ্ন কিংবা প্রতিবাদ।

যাইহোক, এপর্যন্ত আলোচনায় নীরেন্দ্রনাথ রচিত বেশ কিছু কাব্যের কবিতা কিংবা দু-একটি অগ্রন্থিত 'সংযোজনা'র কবিতাকে ধরে সেই কবিতার 'বাহির' অর্থাৎ উৎস মূলের নিরেট তথ্যকে অনুসরণ করে কবিসত্তার মৌল প্রবণতাকে ('আমি তো কবিতাকে কোনও কল্পনালতা ভাবি না') বোঝার চেষ্টা করেছি। প্রসঙ্গত এটাও উল্লেখ্য, এইসূত্রে তাঁর কবিতার ভেতরকার অর্থের (ভাষার এমন স্তর-বিশেষ 'যা কিনা অন্যবিধ একটা দ্যোতনা এনে দেয়') প্রতিও আমরা মনোযোগী ছিলাম। উদাহরণস্বরূপ আর একবার 'ঢেউ' কবিতার কথা বলতে পারি। ইতিপূর্বে আমরা লক্ষ করেছি, 'ঢেউ' নামক এক ভাষাতীত বিচিত্র বর্ণময় অস্তিত্বের দ্যোতনাকে। 'অন্ধকার বারান্দা' (চৈত্র ১৩৬৭ / এপ্রিল ১৯৬১) কাব্যের নিরীহ সাদামাটা 'অল্প-একটু আকাশ' (১৮ ভাদ্র, ১৩৬৪/ ১৯৫৭) কিংবা অতিপরিচিত 'অমলকান্তি' (২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫/ ১৯৫৮) কবিতা এবিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'ক্ষান্তবর্ষণ কাক-ডাকা বিকেলের সেই লাজুক রোদ্দুর,/ জাম আর জামরুলের পাতায় / যা নাকি অল্প-একটু হাসির মতন লেগে থাকে।' — এসব ভাষার সুষমা নিমেষে কবিতাকে উন্নীত করে বচনাতীত স্তরে। অমলকান্তি চিরকালের মতো পাঠকের মনে ছাপ রেখে দেয়।

'নীরক্ত করবী' (ফেব্রুয়ারি ১৯৬৫) কাব্যের স্বল্পপরিচিত আর একটি কবিতা হল 'জিম করবেটের চব্বিশ ঘন্টা' (১৮ মাঘ, ১৩৬৮/ ১৯৬১)। এই কবিতায় অবচেতন 'মনের মধ্যে হলুদ-কালো চতুর একটা ছায়া'র কথা বলতে শোনা যায় বারংবার। বলাবাহুল্য, 'হলুদ-কালো চতুর একটা ছায়া'র ব্যাপ্তি কেবল বাঘের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কেননা 'জলেস্থলে তরুলতায়— ছায়া পড়ে' যার, সে আর 'শিকার' থাকে না শেষে : 'এখন আমি বুঝব কিসে/ শিকার কিংবা শিকারি সে—/ ছায়া পড়ে।' কবিতায় জিম করবেট-বাঘ — এসবকে অতিক্রম করে অবচেতন মনের চিত্তকূটও 'হলুদ-কালো চতুর' ছায়ার মতো সমগ্র কবিতার আবহকে আবিষ্ট করে রাখে।

'নক্ষত্র জয়ের জন্য' (মে ১৯৬৯) কাব্যের কম পরিচিত 'অমানুষ' (২৪ অগ্রহায়ণ, ১৩৭১/ ১৯৬৪) কবিতাটির বিষয় হল এক শিম্পাঞ্জি। চিড়িয়াখানার এক বিমর্ষ শিম্পাঞ্জির আচরণ প্রায় মানুষের মতো, সে ঝিলের কিনারে দারুণ দুঃখিতভাবে বসে ছিল। একা। তবু সম্পূর্ণ মানুষ নয় সে। অথচ তার এমন একাকিত্বের বিপ্রতীপে 'দর্শকদের পুরোপুরি বাঁদুরে কায়দায় টিটকিরি দিয়ে বাঘের খাঁচার দিকে চলে যাওয়া'কে কবি নিদারুণভাবে অর্থবহ করে তুলেছেন। ধাঁধা লেগে যায়, বোঝা যায় না, কে অমানুষ ? শিম্পাঞ্জি নাকি বাঁদুরে কায়দায় টিটকিরি দেওয়া দর্শক-মানুষ ?

আবার 'কলকাতার যীশু' (১৯৬৯) কাব্যে 'তুমি দেখে নিও'[৪৭] (৪ মাঘ, ১৩৭৫/ ১৯৬৯) কবিতাকে জীবনের পরমতম আশ্বাসবাণী (একে-একে বানিয়ে তুলব সব, তুমি দেখে নিয়ো[৪৮]) বলে যেমন অভিহিত করা যায়, সেরকমই 'মুষলপর্ব' (৯ বৈশাখ, ১৩৭৬/ ১৯৬৯) কবিতায় আসন্ন ক্লেদাক্ত রক্তক্ষয়ী কালপর্ব (চতুর্দিকে যখন দুর্নিমিত্তের ছড়াছড়ি,/ যখন বিড়ালগুলি কুকুরের গলায়, এবং/ কুকুরগুলি বাঘের গলায় ডাকছে,/ তখন/ সেই মুষলপর্বের সূচনায়) লক্ষণীয়। এই কবিতার বড় সম্পদ হল রূপকের ব্যঞ্জনা। মালতী, বকুল, কামিনী ও মল্লিকা কেবল 'পরিচিত গন্ধপুষ্প' নয়, তারা রূপকের অন্তরালবর্তী মুষলপর্বের অসহায় নারী।

'উলঙ্গ রাজা' (১৯৭১) কাব্যের বিখ্যাত 'উলঙ্গ রাজা' (৩ পৌষ ১৩৭৬/ ১৯৬৯) কবিতায় স্বৈরাচারী প্রশাসকের বিপরীতে এক শিশুর মধ্যে নির্ভীক ভবিষ্যতের কথাও উচ্চারিত হতে শোনা যায়। 'রাজা, তোর কাপড় কোথায় ?' — এ কেবল আজ আর কবিতার ছত্র নয় শুধু, অসামান্য বেদপ্রবচন। এই একই কাব্যের বিশিষ্ট কবিতা হল 'কলঘরে চিলের কান্না' (১৯ ফাল্গুন, ১৩৭৬/ ১৯৭০)। এই কবিতায় চিল-এর রূপকে কবি 'ঊর্ধ্বাচারী মানুষ'কেই দেখেছেন, দেখেছেন তাঁর 'লাঞ্ছনা'কে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, 'গগনবিহারী চিল' শেষপর্যন্ত আর পাখি নয়, আসলে সে 'অফুরন্ত আকাশের প্রাণমূর্তি'।

এমন 'প্রাণমূর্তি'র প্রকাশ তাঁর বিভিন্ন কাব্যের ভিন্ন ভিন্ন কবিতায় বা কবিতার আশেপাশে মূর্ত হতে দেখা যায়। নীরেন্দ্রনাথের কবিতা-জগৎ থেকে অন্তত তিনটি নিদর্শন আমরা উপস্থাপন করতে পারি।

তাঁর 'খোলা মুঠি' (অগ্রহায়ণ ১৩৮১/ ডিসেম্বর ১৯৭৪) কাব্য উৎসর্গ করেছিলেন 'ক্যানসার রোগে আক্রান্তা' জামসেদপুরের পূরবী মুখোপাধ্যায়কে তাঁর 'সাহসের জন্য'। পূরবী মুখোপাধ্যায়ের তিরোধানের পর 'পাগলা-ঘন্টি' (মাঘ ১৩৮৭/ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১) কাব্যের নাম-কবিতায় (১৭ শ্রাবণ, ১৩৮৫/ ১৯৭৮) কবি তাঁকে স্মরণ করেছেন এভাবে : 'ভোরবেলার হাওয়া/ পাগলা-ঘণ্টি বাজাতে-বাজাতে এসে বলল, তুমি কাকে/ ডাকছ, সে তো সুবর্ণরেখার বাঁকে/ কাল রাতে মিলিয়ে গেছে, আমরাই ক'জন/ তাকে নিয়ে তরঙ্গে দিয়েছি বিসর্জন,/ তার প্রগল্‌ভ হাসি আর বাজবে না কক্ষনো কোনোখানে।'

দ্বিতীয় নিদর্শন হল 'জঙ্গলে এক উন্মাদিনী' (জানুয়ারি ১৯৮৯) কাব্যের 'হাসপাতাল' বিষয়ক তিনটি কবিতা (১, ২ ও ৩) যথাক্রমে ১৯ ভাদ্র, ১৩৯৪/ ১৯৮৭ তারিখের প্রথম কবিতা এবং ২০ ভাদ্র, ১৩৯৪/ ১৯৮৭ তারিখের দ্বিতীয় ও তৃতীয় কবিতা। ১৯৮৭ সালের আগস্ট মাসে কবি হাসপাতালে ভর্তি হন। ওই সময় রোগাক্রান্ত কবিকে কবিতা লেখার জন্য গোপনে কিছু কাগজ ও ডট-পেন্সিল জোগান দিয়েছিলেন একজন 'করুণাময়ী' নার্স[৪৯]। সেই সেবিকার নাম মনে করতে না পারলেও কবিতা-সমগ্র ৩-এর 'গ্রন্থপরিচয়' অংশে এজন্যে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন কবি। কবিতায় প্রত্যক্ষত উপস্থিত না হলেও সেই নার্স এই কবিতা তিনটির পরোক্ষ প্রণোদনা শক্তি।

তৃতীয় উদাহরণ বেলজিয়ামের বিখ্যাত শিল্পী ফেলিক্স দ্য বুক, যিনি আবার 'মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে বিশ্বাসী'। 'আয় রঙ্গ' (জানুয়ারি ১৯৯১) কাব্যের 'গান্ধীজির চিত্রমালা' (১৭ শ্রাবণ, ১৩৯৬/ ১৯৮৯) কবিতায় দেখা যায় : "একোত্তীর্ণ-নবতিবর্ষীয় শিল্পী ফেলিক্সের চোখে/ কৌতুক ঝিলিক মারে। পরক্ষণেই তিনি খুব স্থির/ গলায় বলেন, 'এই গ্রন্থে আছে মহাত্মা গান্ধীর/ তিনিখানি আলেখ্য, যার মধ্যে এই ভক্তের শ্রদ্ধাও/ ধরা রইল' " ইত্যাদি। ১৮৮৯-তে নীরেন্দ্রনাথ 'বেশ-কিছু' দিন বিদেশে ছিলেন।[৫০] সেই সময়কার কবিতা এটি।

এবারে শেষ একটি চিত্তাকর্ষক প্রসঙ্গে আসি। কবিতা-সমগ্র ৫-এ (ডিসেম্বর ২০০৮) 'লেখকের কথা'য় কবি জানিয়েছিলেন পঞ্চম খণ্ডের পর আর কোনো খণ্ড প্রকাশ হবে না এবং নতুন কোনো কাব্যগ্রন্থও আর মুদ্রিত হবে না। এরপরে যদি তিনি 'দুটি-চারটি' কবিতা লেখেন তা পরবর্তী সময়ে পঞ্চম খণ্ডেই যুক্ত হবে। কিন্তু কার্যত দেখা গেল 'দুটি-চারটি' কবিতা নয়, তিনটি খাতা জুড়ে তিনি মোট দুশো আটচল্লিশটি কবিতা লিখেছিলেন। তাই স্বতন্ত্রভাবে কবিতা-সমগ্র ৬ বা ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। দেখা যায়, প্রায় তিরিশটি কাব্যগ্রন্থ, একটি কাব্যনাট্য (প্রথম নায়ক, জুলাই ১৯৬১) এবং আরো সংযোজিত কবিতা (সংখ্যাটা চারশো তিরানব্বই) আঙ্গিকভাবেও তাঁর কবি অস্তিত্বের (এক্সিসটেন্স) সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। আর আশ্চর্যের বিষয়, একেবারে শেষ পর্যায়ের তিনটি খাতার প্রথমটিতে 'অমলকান্তি, আবার' নামে একটি কবিতা আছে। এই অমলকান্তি একেবারে গোড়ার দিককার কাব্যগ্রন্থ 'অন্ধকার বারান্দা' (১৩৬৭/ ১৯৬১)-র অমলকান্তি। এই অমলকান্তির মুখকে কবি ভুলতে পারেননি। যে-রাতে তাঁর ঘুম আসে না, তাকে কবি স্পষ্ট দেখতে পান। মধ্যরাতে সে কবির নিদ্রাহীন চোখের সম্মুখে এসে দাঁড়ায় : 'শিরা-ওঠা শীর্ণ মুখখানি/ দেখে যুগ-যুগান্তর পরেও নির্ভুল যায় চেনা/ ইস্কুলের পুরনো বন্ধুকে। তার সেই/ রোদ্দুর হওয়ার/ বাসনার বেদনার রেশ/ স্মৃতি থেকে/ মুছে যায় না, কিছুতে মোছে না।'

নীরেন্দ্রনাথের কবিতাও পুরনো বন্ধুর মতো পাঠকের মনে স্মৃতিলোকে অমলিন থেকে যায়।

Reference:

১. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, কবিতার দিকে, অশোককুমার সরকার (সম্পাদিত), সংযুক্ত সম্পাদক: সাগরময় ঘোষ, দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৯, ৩৯ বর্ষ, সংখ্যা ২৮, পৃ. ২৩৩

২. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার: মল্লিকা সেনগুপ্ত-র নেওয়া, হর্ষ দত্ত (সম্পাদিত), বইয়ের দেশ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, এপ্রিল-জুন ২০০৬, পৃ. ১৩৬

৩. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার: মধুশ্রী সেন সান্যাল-এর নেওয়া, কবি নীরেন্দ্রনাথ যাপনে জিজ্ঞাসায়, সপ্তর্ষি

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 53 - 61
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রকাশন; প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৩১০

৪. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার: মল্লিকা সেনগুপ্ত-র নেওয়া, পূর্বোক্ত বইয়ের দেশ, পৃ. ১৩৭

৫. 'দেশ পত্রিকায় আমার প্রথম প্রকাশিত লেখাটি, কোনও কবিতা নয়, একটি গল্প।'— দ্র. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার: মল্লিকা সেনগুপ্ত-র নেওয়া, পূর্বোক্ত বইয়ের দেশ, পৃ. ১৩৭

৬. তদেব।

৭. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর আর একটি পরিচিত ছদ্মনাম ছিল 'কবিকঙ্কণ' ।

৮. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, কবিতা-সমগ্র ১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, একাদশ মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৯ (প্রথম সংস্করণ, নভেম্বর ১৯৮২), পৃ. ২৮০

৯. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, কবিতার ক্লাস, অরুণা প্রকাশনী, দ্বাদশ সংস্করণ, মাঘ ১৪০৮/ জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৩১

১০. তদেব, পৃ. ৩৩

১১. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, কবিতার দিকে, পূর্বোক্ত দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৯, পৃ. ২৩৫

১২. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার: মধুশ্রী সেন সান্যাল-এর নেওয়া, পূর্বোক্ত কবি নীরেন্দ্রনাথ যাপনে, জিজ্ঞাসায়, পৃ. ৩১১

১৩. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, কবিতার দিকে, পূর্বোক্ত দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৯, পৃ. ২৩৫

১৪. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, নীরবিন্দু (অখণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, প্রথম অখণ্ড সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৬/ বৈশাখ ১৪২৩, পৃ. ৩৫৪

১৫. তদেব, পৃ. ৩৭৭

১৬. নিজের বইটি অন্যত্র (গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের 'মিত্রালয়') ছাপার ব্যবস্থা করেন।

১৭. প্রথম আনন্দ-সিগনেট সংস্করণ ডিসেম্বর ২০১১-তে 'নীলনির্জন' কবিতা বইয়ের প্রথম কবিতা হল 'হৃদয়-সময়-স্বপ্ন'

১৮. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত কবিতা-সমগ্র ১, পৃ. ১১

১৯. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, কবি অরুণকুমার, অরুণকুমার সরকার কবিতাসমগ্র, দ্বিতীয় মুদ্রণ, নভেম্বর ২০০৬ (প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৯৩), পৃ. ৯

২০. মুখার্জি, মধুশ্রী, প্রবন্ধ চতুষ্টয়, সমসাময়িক প্রকাশনা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০১৫, পৃ. ৪৭

২১. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার: মধুশ্রী সেন সান্যাল-এর নেওয়া, পূর্বোক্ত কবি নীরেন্দ্রনাথ যাপনে, জিজ্ঞাসায়, পৃ. ৩১৩

২২. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার: মল্লিকা সেনগুপ্ত-র নেওয়া, পূর্বোক্ত বইয়ের দেশ, পৃ. ১৩৮

২৩. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার: মধুশ্রী সেন সান্যাল-এর নেওয়া, পূর্বোক্ত কবি নীরেন্দ্রনাথ যাপনে, জিজ্ঞাসায়, পৃ. ৩২৫

২৪. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, কবিতা-সমগ্র ২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, সপ্তম মুদ্রণ, ২০১৬ (প্রথম সংস্করণ, জুলাই ১৯৮৫), পৃ. ১৩৪

২৫. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত নীরবিন্দু, পৃ. ৩৭৫

২৬. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, কবিতার কী ও কেন, দে'জ পাবলিশিং, পঞ্চম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০৬, পৃ. ২০

২৭. তদেব, পৃ. ২০

২৮. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার: মধুশ্রী সেন সান্যাল-এর নেওয়া, পূর্বোক্ত কবি নীরেন্দ্রনাথ যাপনে, জিজ্ঞাসায়, পৃ. ৩১৮

২৯. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার: মল্লিকা সেনগুপ্ত-র নেওয়া, পূর্বোক্ত বইয়ের দেশ, পৃ. ১৪৪

৩০. তদেব, পৃ. ১৪৩-৪৪

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 53 - 61
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৩১. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার: মধুশ্রী সেন সান্যাল-এর নেওয়া, পূর্বোক্ত কবি নীরেন্দ্রনাথ যাপনে, জিজ্ঞাসায়, পৃ. ৩৩২

৩২. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, কবিতা-সমগ্র ৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, চতুর্থ মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৬ (প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৯৩), পৃ. ৩০০-০১

৩৩. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার: মধুশ্রী সেন সান্যাল-এর নেওয়া, পূর্বোক্ত কবি নীরেন্দ্রনাথ যাপনে, জিজ্ঞাসায়, পৃ. ৩৩২

৩৪. কলকাতার যীশু কাব্যের প্রকাশকাল অগ্রহায়ণ ১৩৭৬/ ডিসেম্বর ১৯৬৯। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা-সমগ্র ১-এ অন্তর্ভুক্ত 'কলকাতার যীশু' কাব্যগ্রন্থের সূচি ও মূল কবিতায় বানান পরিবর্তিত করে রাখা হয়েছে: কলকাতার যিশু

৩৫. ১৯৭৪ সালের সাহিত্য আকাদমি পুরস্কার প্রাপ্ত এই কাব্যগ্রন্থ।

৩৬. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, কবিতার দিকে, পূর্বোক্ত দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৯, পৃ. ২৩৮

৩৭. তদেব, পৃ. ২৩৯

৩৮. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, কবিতা-সমগ্র ২, পৃ. ২৭৮

৩৯. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার: মধুশ্রী সেন সান্যাল-এর নেওয়া, পূর্বোক্ত কবি নীরেন্দ্রনাথ যাপনে, জিজ্ঞাসায়, পৃ. ৩২১

৪০. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত কবিতা-সমগ্র ২, পৃ. ২৭৮

৪১. তদেব

৪২. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত কবিতা-সমগ্র ৩, পৃ. ৩১১

৪৩. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার: মধুশ্রী সেন সান্যাল-এর নেওয়া, পূর্বোক্ত কবি নীরেন্দ্রনাথ যাপনে, জিজ্ঞাসায়, পৃ. ৩৩৩

৪৪. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, কবিতা-সমগ্র ৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০০, পৃ. ২৯৪ (তিনটি অধ্যায়ের দ্বিতীয়টি 'স্বয়ংসম্পূর্ণ কবিতা' রূপে 'সানন্দা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।)

৪৫. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত কবিতা-সমগ্র ৪, পৃ. ২৯৪-৯৫

৪৬. তদেব, পৃ. ৯৬

৪৭. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত কবিতা-সমগ্র ১-এ সূচিপত্রতে বানান রয়েছে: নিও।

৪৮. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত কবিতা-সমগ্র ১-এ বানান রয়েছে: নিয়ো।

৪৯. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত কবিতা-সমগ্র ৩, পৃ. ৩১২

৫০. তদেব, পৃ. ৩১৩